ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 266-275
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.458

জ্ঞানলাভের উৎস হিসেবে শব্দ ও Testimony: ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

মহসিনা খাতুন, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 04.04.2026; Accepted: 09.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This article presents a comparative discussion on Sabda-pramāna in Indian philosophy and Testimony in Western philosophy. We all know that both philosophies accepted that our knowledge is never limited to direct experience only. We acquire knowledge through various things such as written or oral statements or teachings of other people of the society in which we live. This mode of acquiring knowledge through others is mainly called sabda-pramāna in Indian philosophy, whereas, in Western philosophy it is called Testimony. But there are several differences between the two philosophies regarding the acquisition of knowledge from the sabda or testimony of others. In Indian philosophy, especially in the Nyaya, Mimamsa and Vedanta, Sabda has been accepted as a source of knowledge, but Buddhists and Vaisheshikas have considered this sabda to be reduced from direct experience or inference. We observe this same kind of discussion in Western philosophy, for example, in Western philosophy; John Locke did not accept Testimony as an independent source of knowledge. But theories like Reductionism and Direct view have accepted the practical value of Testimony. In this article, I have tried to show by the comparative analysis of both the philosophies that the discussion on Sabda-pramāna in Indian philosophy is more fundamental, and it has an independent and important role in Indian epistemology. On the contrary, in Western philosophy, Testimony is more controversial and critically discussed which does not appear to be so significant.

Keywords: Sabda-pramāna, Testimony. Locke, Reductionism, Nyaya,Mimamsa, Knowledge

জ্ঞান কেবলমাত্র মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়না। আমরা দেখি যে মানুষ অনেক সময় অনেক কিছু শিখে, জানে, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অন্য মানুষের কথা শুনে, বই পড়ে, গুরুজনের উপদেশ গ্রহণ করে, অথবা একে অপরের সাথে বিভিন্ন ধরনের তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে। শব্দের গুরুত্ব তখন স্পষ্ট হয় যখন আমরা দেখি যে একজন ব্যক্তি অন্য সকল ব্যক্তির লিখিত বা মৌখিক ও বইয়ের সাথে সমস্ত যোগাযোগ থেকে বঞ্চিত হয় এই সামাজিক জ্ঞানপ্রক্রিয়া দর্শনের ইতিহাসে বিশেষভাবে গুরুত্ব লাভ করেছে। ভারতীয় যুক্তিবিদ্যায়, যথার্থ জ্ঞান হল প্রমা এবং যথার্থ জ্ঞানের উপায়গুলি প্রমাণ নামে পরিচিত। প্রমাণ সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনের সবচেয়ে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি হল শব্দের আলোচনা। কারণ শব্দ-প্রমাণ জ্ঞানের একটি

গুরুত্বপূর্ণ উৎস। অনুরূপ ভাবে পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্ব জ্ঞানের বিভিন্ন ধরন প্রত্যক্ষণ, যুক্তি, আত্মনিরীক্ষণ এবং স্মৃতির সাথে সাথে শব্দকে জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের একটি উপায় হিসেবে স্বীকৃতি দেয় যেহেতু আমাদের অনেক জ্ঞান ভাষাগত। ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বগুলি শব্দকে শুধু একটি প্রমাণ হিসেবেই স্বীকৃতি দেয় না, বরং সম্ভাব্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সীমা অতিক্রম করে এমন সমস্ত বিষয়ে আমাদের জ্ঞান প্রদান করে যেগুলিকে কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায়না। চার্বাক, বৌদ্ধ ও বৈশেষিক ব্যতীত সকল ভারতীয় দার্শনিক শব্দকে জ্ঞানের একটি স্বাধীন উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। চার্বাক সাধারণভাবে শব্দ প্রত্যাখ্যান করে, কারণ তাঁর মতে এটি বৈধ জ্ঞান প্রদান করেনা তাদের মতে জ্ঞানের একমাত্র উৎস হল প্রত্যক্ষ; শব্দের উৎস রূপে যে বৈদিক জ্ঞানের কথা বলা হয় তা সম্পূর্ণ প্রতারণা, ধূর্ত পুরোহিতদের একটি কৌশল যারা অজ্ঞ জনতাকে প্রতারিত করে এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে। বৌদ্ধ এবং বৈশেষিকরা শব্দ স্বীকার করে কিন্তু তারা জ্ঞানের স্বতন্ত্র উপায় হিসেবে শব্দ কে স্বীকার করেনি। তারা শব্দকে অনুমানের অংশ হিসেবে দেখিয়েছেন। অনুরূপ ভাবে পাশ্চাত্য দার্শনিক লক শব্দ কে জ্ঞানের যথার্থ মাধ্যম বলে মনে করেন নি। শব্দ বিষয়ে এই রূপ বিভিন্ন তত্ত্ব গুলি তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। আমি আমার প্রবন্ধ টিকে তিনটি শ্রেণীতে আলোচনা করবো প্রথম বিভাগে ভারতীয় দর্শনে শব্দ প্রমাণ কীভাবে আলোচিত সেটা দেখানো হবে। দ্বিতীয় বিভাগে পাশ্চাত্য দর্শনে শব্দ প্রমাণ কি ভূমিকা পালন করে সেটা আলোচনা করা হবে। সব শেষে এই দুটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সম্প্রদায় শব্দ প্রমাণ বিষয়ে মৌলিক অবস্থান দেখিয়েছে সেটা তুলে ধরবো।

ন্যায় দর্শনে শব্দ:

ভারতীয় ন্যায় দর্শনে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় 'শব্দ' প্রমাণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। নৈয়ায়িকদের মতে, জ্ঞানের যথার্থ উপায় গুলির মধ্যে শব্দ একটি অন্যতম স্থান অধিকার করে আছে, যার ভিত্তি হলো 'আপ্তবাক্য'। মহর্ষি গৌতম শব্দপ্রমাণের লক্ষণ দিয়েছেন, আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ। তর্কসংগ্রহে বলা হয়েছে "আপ্তবাক্যং শব্দঃ। আপ্তস্তু যথার্থবক্তা"[১] অর্থাৎ, কোনো আপ্ত ব্যক্তির উপদেশ বা নির্দেশই শব্দপ্রমাণ নামে পরিচিত। এই ধরনের উপদেশ থেকে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাকে শাব্দজ্ঞান বলে। এখন প্রশ্ন হল আপ্ত কে? যিনি পদার্থের যথার্থ তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করেছেন এবং নিজের জ্ঞাত বিষয় অন্যদেরকে অবগত করার অভিপ্রায়ে সঠিক রূপে উপদেশ দেন, তিনিই আপ্ত ব্যক্তি। এমন আপ্ত ব্যাক্তির উপদেশ থেকেই শাব্দজ্ঞান উৎপন্ন হয়। গৌতমের মতে, শাব্দজ্ঞান বলতে সাধারণভাবে যেকোনো শব্দ থেকে উৎপন্ন জ্ঞানকে বোঝায় না সব শাব্দজ্ঞান যথার্থ নয়। আপ্ত ব্যাক্তির উপদেশ যেমন যথার্থ জ্ঞান দেয়, তেমনি অনাপ্ত (অবিশ্বস্ত) ব্যক্তির উপদেশ থেকেও জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে, কিন্তু তা যথার্থ জ্ঞান অর্থাৎ প্রমা নয়। এখানে যথার্থ বলতে বোঝায় 'অর্থের সঙ্গে বক্তব্যের অভেদ' অর্থাৎ ব্যাক্তি বিষয়টি যেরূপ, সেটিকে সেই রূপ প্রকাশ করেন। শাব্দজ্ঞান কেবল মাত্র ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং জ্ঞানের বিষয়ের প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। ফলে, যে সব ব্যাক্তি গন ভ্রান্ত, উন্মাদ বা প্রতারক চরিত্র বিশিষ্ট তাঁদের বাক্য কখন শব্দপ্রমাণ হতে পারে না। আপ্ত ব্যক্তি এই সকল দোষ মুক্ত হবেন। সুতরাং শব্দ প্রমানে আপ্ত ব্যাক্তি যেমন গুরুত্ব পূর্ণ তেমনি যে সব বাক্যের দ্বারা শাব্দজ্ঞান প্রকাশ করা হয় সেগুলিও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

---

[১] ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়, অন্নংভট্ট বিরচিত *তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহ-দীপিকা,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৮, কারিকা নং ৬৬, পৃ. ২৭৯।

সাধারণ ভাবে শব্দের আলোচনা প্রসঙ্গে শব্দার্থ ও বাক্যার্থ কি সেই আলোচনা উঠে আসে। তর্কসংগ্রহে বলা হয়েছে বাক্য গঠিত হয় পদ সমষ্টি থেকে "বাক্যং পদসমূহঃ যথা গামানয়েতি"[২] 'শব্দ' ও 'পদ' প্রায় সমার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়। যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি কোনো পদার্থ নির্দেশ করার বা সংকেত দেওয়ার শক্তি রাখে, তাকে পদ বলে (শক্তম্ পদম্)। একাধিক পদ মিলে যখন অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন তাকে বাক্য বলে। পদের বৃত্তি অর্থাৎ অর্থবোধের ক্ষমতা দুই প্রকার: শক্তি এবং লক্ষণা। শক্তি দিয়ে পদের স্বাভাবিক অর্থ বোধগম্য হয়। এই পদ থেকে এই অর্থ বুঝতে হবে'— এই রূপ ঈশ্বর প্রদত্ত সংকেতই শক্তি নামে পরিচিত। তর্ক সংগ্রহে বলা হয়েছে "অস্মাৎ পদাৎ অয়মর্থো বোধ্যব্য ইতি ঈশ্বর- সংকেতঃ শক্তিঃ"[৩] যেখানে শক্তি কাজ করে না, সেখানে লক্ষণার সাহায্যে বাক্যের অর্থ বোঝা হয়।

আবার যেকোনো পদসমষ্টিই বাক্য নয়। নৈয়ায়িকগণ বাক্যের অর্থ নির্ণয়ের জন্য চারটি শর্তের উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল "আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতা সন্নিধিশ বাক্যার্থজ্ঞানে হেতুঃ"[৪] অর্থাৎ "আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতা সন্নিধি এবং তাৎপর্য হল অর্থ নির্ণয়ের শরত। নিম্নে সেগুলি আলোচনা করা হলঃ

(১) আকাঙ্ক্ষাঃ তর্কসংগ্রহে বলা হয়েছে "পদন্ত্য পদান্তরব্যতিরেকপ্রযুক্ত-অন্বয়-অননুভাবকত্বম, আকাঙ্ক্ষাআকাঙ্ক্ষা"[৫] আকাঙ্ক্ষা বলতে একটি পদের সঙ্গে অন্য একটি পদের অন্বয়ের প্রয়োজনবোধকে বোঝায়। বক্তা যখন কোনো বাক্য ব্যবহার করেন, তখন তিনি কিছু প্রকাশ করতে চান। সেই ভাব পরিস্ফুট করার জন্য পদগুলির মধ্যে অন্বয় থাকা জরুরি। কেবল কয়েকটি পদ পরপর বসালেই বাক্য হয় না; ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী কর্তার সঙ্গে ক্রিয়া, বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষণের অন্বয় থাকতে হয়। যেমন—'জল আন' বাক্যটি অর্থপূর্ণ, কিন্তু শুধু 'জল' বা শুধু 'আন' পূর্ণ বাক্য নয়।

(২) যোগ্যতাঃ যোগ্যতা হলো পদসমূহের পারস্পরিক অবিরোধ (অর্থাৎ পরস্পর বিরোধহীনতা)। তর্কসংগ্রহে বলা হয়েছে "অর্থা-বাধো যোগ্যতা"[৬] কোনো পদের সঙ্গে কোনো পদের অবিরোধ সম্বন্ধ না থাকলে সেই বাক্য অর্থপূর্ণ হয় না। যেমন— 'জলের' সঙ্গে 'তাপের' অবিরোধ নেই, আবার 'বহ্নির' (অগ্নি) সঙ্গে 'শীতলতা'র অবিরোধ নেই। 'বহ্নি শীতল' বলা হাস্যকর। তাই অর্থপূর্ণ বাক্যের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন পদগুলিই পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়।

(৩) সন্নিধি বা আসত্তিঃ "পদানাম্ অবিলম্বেন উচ্চারণং সন্নিধিঃ"[৭] অর্থাৎ সন্নিধি মানে বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলির নৈকট্য। দেশ ও কালের দিক থেকে পদগুলি কাছাকাছি থাকতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, সকালে 'জল' বলার পর বিকেলে 'আন' বললে এই দুই শব্দ মিলে কোনো বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন করতে পারে না।

(৪) তাৎপর্যঃ তাৎপর্য হলো কোনো পদ ব্যবহার করার সময় বক্তার ইপ্সিত (অভিপ্রেত) অর্থ। যেসব পদের একাধিক অর্থ আছে, সেখানে তাৎপর্য অনুধাবন বিশেষ প্রয়োজন। যেমন— 'সৈন্ধব' পদের ব্যাকরণগত অর্থ দ্বিবিধ: অশ্ব ও লবণ। বক্তা কোন অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তা না বুঝলে

---

[২] তদেব, কারিকা নং ৬৬ , পৃ. ২৭৯।

[৩] তদেব, কারিকা নং ৬৬ , পৃ. ২৭৯।

[৪] তদেব, কারিকা নং ৬৭, পৃ. ২৮৩।

[৫] তদেব, কারিকা নং ৬৬, পৃ. ২৮৩।

[৬] তদেব, কারিকা নং ৬৬, পৃ. ২৮৩।

[৭] তদেব, কারিকা নং ৬৭, পৃ. ২৮৩।

বাক্যের যথার্থ ভাব বোঝা যায় না। পরিস্থিতি ও প্রসঙ্গ বিবেচনা করেই তাৎপর্য গ্রহণ করতে হয়। এই চারটি শর্ত পূর্ণ হলেই কোনো বাক্য যথার্থ শাব্দজ্ঞান প্রদান করতে সক্ষম হয়।

ন্যায়দর্শন অনুসারে শব্দ বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত। প্রথম বিভাগ অনুসারে শব্দ দুই প্রকার দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক। দৃষ্টার্থক শব্দ হল যেসব বাক্যের অর্থ প্রত্যক্ষযোগ্য বা ইহলোকে দৃষ্ট হতে পারে। যেমন— বৈজ্ঞানিকের জাগতিক তথ্যসংক্রান্ত উক্তি, উদ্ভিদের গুণাবলী বিষয়ক আয়ুর্বেদের বচন, 'পুত্রেষ্টি' প্রভৃতি লৌকিক যজ্ঞ সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য। অদৃষ্টার্থক শব্দ হল যেসব বাক্যের অর্থ ইহলোকে প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। যেমন— পরলোক সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য, পরমাণু বিষয়ক দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক উক্তি।

দ্বিতীয় বিভাগ হল বৈদিক শব্দ ও লৌকিক শব্দ। বৈদিক শব্দ হল বেদে উক্ত বাক্য, যেমন— উদ্ভিদের গুণাবলী সম্পর্কিত আয়ুর্বেদের উক্তি। যাঁরা বেদে বিশ্বাসী, তাঁদের মতে বেদ অভ্রান্ত। তাই বৈদিক শব্দ সব সময় অভ্রান্ত বলে বিবেচিত হয়। অন্য দিকে লৌকিক শব্দ হল সাধারণ মানুষের বাক্য। লৌকিক শব্দের মধ্যে শুধু আপ্ত ব্যক্তির বাক্যই শব্দপ্রমাণ; অনাপ্ত ব্যক্তির বাক্য প্রমাণ নয়। ন্যায়মত অনুসারে বৈদিক ও লৌকিক— উভয় প্রকার শব্দই পৌরুষেয় (ব্যক্তির দ্বারা উক্ত)। তাই আপ্ত ব্যক্তির বাক্য, লৌকিক হোক বা বৈদিক, শব্দপ্রমাণ হিসেবেই গৃহীত হয়।

কিন্তু বৈশেষিক ও বৌদ্ধ দর্শন শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করে না; তারা এটিকে অনুমান প্রমানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এদের মতে আমরা বক্তার অভিপ্রায় থেকে বাক্যের অর্থ ও সত্যতা অনুমান করতে পারি। কিন্তু ন্যায় দর্শন এই রূপ মতকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, শাব্দজ্ঞান স্বতন্ত্র ভাবে যথার্থ জ্ঞান প্রদান করতে পারে তাই এটিকে অনুমিতির অন্তর্ভুক্ত করা যায়না। কারণ, আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আমরা উপলব্ধি করি যে 'আমি শব্দ থেকে জানছি'— এটি কোনো অনুমান নয়, বরং একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানপ্রক্রিয়া। এই অভিজ্ঞতাগত পার্থক্যই প্রমাণ করে যে শব্দ একটি স্বাধীন প্রমাণ।

সবশেষে বলা যায়, ন্যায় দর্শনে শব্দপ্রমাণের তত্ত্ব ভাষা, অর্থ এবং জ্ঞানের গভীর আন্তঃসম্পর্ককে বিশ্লেষণ করে। এটি দেখায় যে, মানব সমাজে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ভাষা ও শব্দের ভূমিকা কতটা মৌলিক। আপ্ত ব্যক্তির সত্য উক্তি, শব্দ ও অর্থের নির্দিষ্ট সম্পর্ক, এবং বাক্যার্থ উপলব্ধির শর্তসমূহ—এই সবকিছু মিলিয়ে শব্দপ্রমাণ একটি সুসংগঠিত ও যুক্তিসম্মত জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ করে।

মীমাংসা ও অদ্বৈত দর্শনে শব্দ:

মীমাংসা দর্শনে শব্দ-প্রমাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শবরস্বামী শব্দকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন বস্তুর জ্ঞান সম্ভব না হলে সেটির জ্ঞান শব্দের দ্বারা উৎপন্ন হতে পারে। মীমাংসা দর্শনের প্রধান লক্ষ্য হলো বেদে বর্ণিত ক্রিয়াকাণ্ডের যথার্থতা ও ব্যবহারিক মূল্য ব্যাখ্যা করা। কারণ বেদে বিভিন্ন ধরনের যজ্ঞ, যাগ, ইষ্টি প্রভৃতি কর্মের প্রচুর বিধান দেখা যায়। মীমাংসকদের মতে, এই কর্মের বিধানই বেদবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য কে নির্দেশ করে। বেদে নির্দেশিত বাক্য মানুষকে কর্মে প্রণোদিত করে। যেমন ধরা যাক বেদে আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে বাক্য পাওয়া যায়। আত্মার অস্তিত্ব জ্ঞাত হলে মানুষ বুঝতে পারে কর্মফলের ভোক্তা হলাম আমি আত্মা, আর তখনই মানুষ তার কল্যাণের জন্য বেদের বিধিবাক্য অনুসরণ করতে প্রেরণা লাভ করে।

মীমাংসা দর্শনের এই দৃষ্টিভঙ্গি এক ধরনের প্রয়োগবাদ (pragmatism) কে নির্দেশ করে। এটা মনে করা হয়, লৌকিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক— যেকোনো জ্ঞান তখনই মূল্যবান হবে, যখন তা কোনো কাজ করতে মানুষ প্রেরণা দেবে। নিছক জ্ঞানের কোন মূল্য নেই। মীমাংসা মতে ধর্মের স্বরূপ জানার একমাত্র

প্রমাণ হলো নিত্য ও অপৌরুষেয় বেদ। বেদই এখানে শব্দপ্রমাণ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে এগুলি জানা যায় না। অনুমান প্রভৃতি অন্যান্য প্রমাণও প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভরশীল বলে তার দ্বারাও ধর্মের স্বরূপ বোঝা সম্ভব নয়।

মীমাংসক কুমারিল ভট্ট লৌকিক অভিজ্ঞ ব্যক্তির বাক্যকেও শব্দপ্রমাণ হিসেবে স্বীকার করেন। তাঁর মতে,অজ্ঞ ব্যক্তির বচন অর্থাৎ অনাপ্তবাক্য বাদ দিলে বাকি সব বাক্যই জ্ঞান উৎপাদনে সক্ষম, তাই তারা শব্দপ্রমাণ সুতরাং কুমারিলের মতে শব্দপ্রমাণ দুই প্রকার: পৌরুষেয় শব্দপ্রমাণ হল কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির বচন থেকে অর্জিত জ্ঞান। স্মৃতি, পুরাণ ও পুরুষরচিত দর্শনগ্রন্থও এর অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে অপৌরুষেয় শব্দপ্রমাণ হল বেদবাক্য, যা কোনো পুরুষ কর্তৃক রচিত নয়।

নারায়ণ ভট্ট শাব্দজ্ঞানের লক্ষণ গিয়ে বলেছেন 'তত্র তাবৎ পদৈর্জাতৈঃ পদার্থস্মরণে কৃতে। অসন্নিকৃষ্টবাক্যার্থজ্ঞানং শাব্দমিতীর্যতে' অর্থাৎ প্রথমে পদগুলি জ্ঞাত হয়। পদগুলি জানার পর সেগুলির অর্থ স্মৃতিতে উদিত হয়। পদার্থ স্মরণের পর অসন্নিকৃষ্ট বাক্যার্থের যে জ্ঞান হয়, তাকে শাব্দপ্রমা বলে। অসন্নিকৃষ্ট বাক্যার্থ বলতে সেই বাক্যার্থকে বোঝায় যা পূর্বে জানা ছিল না এবং যা বাধিত হয় না। পূর্বে জানা ছিল (সন্নিকৃষ্টার্থ) এবং বাধিত হয়— এমন বাক্যার্থ যথাক্রমে অনুবাদস্বরূপ অতএব তা প্রমা নয় ও ভ্রমাত্মক অর্থাৎ প্রমা নয়।

কুমারিল ভট্ট বলেন, শুধু বেদই নয়, অক্ষরবাচক (বর্ণাত্মক) শব্দমাত্রই নিত্য। তাই তিনি আপ্তবাক্যের প্রামাণ্যও স্বীকার করেন। শব্দপ্রমাণ হলো বাক্যার্থজ্ঞান। একাধিক পদ পরস্পর অন্বিত হয়ে যে সামগ্রিক অর্থ প্রকাশ করে, তাই বাক্যার্থ। শব্দার্থকে অভিধান বলা হয়। কোনো শব্দ যে বস্তু বা ধারণা বোঝায়, তা ঐ শব্দের অভিধেয়। শব্দের অর্থ অভিধাবৃত্তি দ্বারা প্রকাশিত হয়। এই বৃত্তিই শব্দের শক্তি। নৈয়ায়িকরা ক্ষেত্রবিশেষে জাতি, ব্যক্তি ও আকৃতিতে শব্দের শক্তি স্বীকার করেন। কিন্তু মীমাংসকরা কেবল জাতি বা আকৃতিতেই শক্তি স্বীকার করেন। শ্লোকবার্তিকে বলা হয়েছে 'জাতিমেবাকৃতিং প্রাপ্য ব্যক্তিরাক্রিয়তে যয়া'— যার দ্বারা ব্যক্তি আকৃত বা নিরূপিত হয়, তাই আকৃতি। তবে আকৃতি বা জাতি শব্দের মুখ্য বাচ্যার্থ হলেও ব্যক্তি গৌণ বাচ্যার্থ।

মীমাংসক কুমারিলের মতে, লৌকিক বা বৈদিক— সকল পদ অন্য পদের অপেক্ষা না রেখেই একটি অর্থ প্রকাশ করে। এই অর্থ অভিধাবৃত্তি থেকে পাওয়া যায়। অভিধা থেকে পদের যে অর্থজ্ঞান হয়, তা অভিধান। এই অভিধালব্ধ পদার্থজ্ঞান থেকে পরে বাক্যার্থের জ্ঞান জন্মায়। বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবের মাধ্যমেই পরস্পরের অন্বয় সম্ভব হয়। কুমারিলের এই মত অভিহিতান্বয়বাদ নামে পরিচিত। অপর মীমাংসক প্রভাকর এই মত সমর্থন করেননি। তিনি অন্বিতাভিধানবাদী। তাঁর মতে, পদার্থের জ্ঞানের জন্য পদকে আগে পদের ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বিত হতে হয়। অন্বিত শব্দেরই শক্তি গ্রহণ করা হয়। প্রথমে পদসমূহের দ্বারা

মীমাংসকরা শব্দকে দুই প্রকারে ভাগ করেন: বর্ণাত্মক শব্দ: 'ক', 'খ', 'গ' প্রভৃতি বর্ণ। এগুলির সাহায্যে শব্দ, ধাতু প্রভৃতি গঠিত হয়। মীমাংসকদের মতে এগুলি নিত্য। ধ্বন্যাত্মক শব্দ: কেবল ধ্বনিমাত্র, যেমন ঝড়ের শব্দ। এগুলি অনিত্য। ভাট্ট মীমাংসকদের মতে, শব্দপ্রমাণ হলো বাক্যার্থজ্ঞান। একাধিক পদ পরস্পর অন্বিত হয়ে যে সামগ্রিক অর্থ প্রকাশ করে, তাই বাক্যার্থ। শব্দার্থ (পৃথক পদের অর্থ) বলা হয় অভিধান। যখন শব্দার্থ আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও সন্নিধির সাহায্যে পদসমষ্টির অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে বাক্যার্থ বলে।

অদ্বৈত বেদান্ত অন্যান্য ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের মাপকাঠি পরীক্ষা করে তার জ্ঞানের মাপকাঠির তত্ত্ব শুরু করে। শঙ্কর, ন্যায় অনুসরণ করে, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও মৌখিক শব্দকে বৈধ জ্ঞানের উপায় হিসেবে স্বীকার করেন।

পাশ্চাত্য দর্শনে শব্দ (Testimony):

জ্ঞানের জগতে যেমন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রয়োজন আছে তেমনি আবার পরোক্ষ জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। দূরবর্তী অঞ্চলের ভূগোল থেকে শুরু করে আমাদের বন্ধুদের জীবনের সাধারণ ঘটনা— সব কিছু বোঝার জন্য আমরা অন্যদের ওপর নির্ভরশীল। অন্য মানুষকে তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ যদি আমাদের না থাকত, তাহলে প্রাচীন ইতিহাসের নানা বিষয় সম্পর্কে আমাদের কন ধারনা থাকত না। স্পষ্টতই, শব্দ আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ায়; প্রশ্ন হলো, কীভাবে শব্দের দ্বারা আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয় ? অর্থাৎ অন্য মানুষের কথা শোনা বা তাদের লেখা পড়া— কিভাবে আমাদের জ্ঞান প্রদান করে? এর পদ্ধতি কি স্বতন্ত্র পদ্ধতি? ইত্যাদি প্রশ্ন গুলি স্বাভাবিক ভাবে উত্থাপিত হয়। এখন আমরা সেগুলি নিয়ে আলোচনা করব। কিছু দার্শনিক জন লক যেমন যুক্তি দেন যে শব্দ কখনোই প্রকৃত জ্ঞান সরবরাহ করে না অপর দিকে, কিছু দার্শনিক মনে করেন যে শব্দ শুধু জ্ঞান দেয় তাই নয়, বরং তা এক বিশেষ উপায়ে দেয়। তাদের মতে, শব্দ জ্ঞানলাভের একটি বিশেষ মাধ্যম, যার মর্যাদা ইন্দ্রিয় উপলব্ধি ও যুক্তির মতোই মৌলিক।

প্রথমে আমাদের জানা প্রয়োজন 'শব্দ' বলতে আমরা কী বুঝি। শব্দ প্রদান মানে হলো— কেউ আপনাকে কথায়, ইশারায় বা লেখায় কিছু জানায়; আর সেই আদান-প্রদান থেকে আপনি যা বোঝেন, তাতে বক্তার কথার বিষয়বস্তু একটি বিশেষ ভূমিকা রাখে। যাঁরা শব্দভিত্তিক জ্ঞান নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেন, তাঁরাও স্বীকার করেন যে কারও কথা শোনা বা পড়ার ঘটনা থেকে সাধারণ প্রত্যক্ষ জ্ঞান তৈরি হতে পারে। যেমন ধরুন, আপনি দেখলেন কেউ একটি কাগজের টুকরোতে লিখেছে 'আমার হাতের লেখা সুন্দর' অথবা শুনলেন কেউ বলছে 'আমার গলার স্বর কর্কশ'। আপনি যদি সত্যিই লেখাটি সুন্দর দেখতে পান অথবা স্বরটি কর্কশ শুনতে পান, তাহলে বক্তার কথার সত্যতা আপনি জানতে পারবেন। যদি আপনি আমার শব্দের ভিত্তিতে কিছু বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনি আমি কী বলছি তা বোঝেন এবং আমার কথাটি মেনে নেন।

জন লকের মতে, উপলব্ধিগত জ্ঞান (যেমন, 'এখন যে কণ্ঠস্বর শুনছি সেটি কর্কশ') এবং শব্দ থেকে পাওয়া জ্ঞান (যেমন, 'স্মিথ চাকরি পেয়েছে') — এর মধ্যে গভীর পার্থক্য রয়েছে। মূল পার্থক্য হলো নিশ্চয়তা। লকের মতে, জ্ঞানের জন্য নিশ্চয়তা আবশ্যক। উপলব্ধি আপনাকে কোনো বিষয়ে সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চিত করতে পারে, যেমন আপনি স্বজ্ঞাতভাবে নিশ্চিত যে লাল কালো নয়; তাই উপলব্ধির মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন সম্ভব। লক বলেন, শব্দ থেকে যা পাওয়া যায়, তা সর্বোচ্চ সম্ভাব্য, কিন্তু নিশ্চিত নয়। ইংরেজি শীতকালে, যদি আপনি দেখেন একজন লোক বরফে ঢাকা হ্রদের ওপর দিয়ে হাঁটছে, তাহলে আপনি জানেন যে লোকটি হ্রদটি পার হচ্ছে। যদি অন্য কেউ আপনাকে বলে যে সে একজন লোককে হ্রদের ওপর দিয়ে হাঁটতে দেখেছে, তবে যতক্ষণ আপনার তথ্যদাতা বিশ্বস্ত এবং তার কথাগুলো আপনার নিজের অতীত পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মেলে, ততক্ষণ সেই বাক্যটিকে সত্য হওয়া অত্যন্ত সম্ভাবনাময় মনে করা যুক্তিযুক্ত।

আমাদের নিজেদের অতীত অভিজ্ঞতা এখানে একটি গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লক সিয়ামের রাজার গল্পের উল্লেখ করে বলেন যে এক ডাচ রাষ্ট্রদূত জানালেন যে হল্যান্ডে শীতকালে জল এত শক্ত হয় যে তাতে মানুষের ওজন, এমনকি হাতির ওজনও বহন করা যায়। রাজা উত্তর দিলেন: 'এখন পর্যন্ত তোমার বলা সব অদ্ভুত কথা আমি বিশ্বাস করেছি, কারণ আমি তোমাকে একজন সৎ ও যুক্তিবাদী মানুষ মনে করতাম; কিন্তু এখন আমি নিশ্চিত তুমি মিথ্যে বলছ।' লক সন্দিহান রাজার পক্ষে সহানুভূতি প্রকাশ করেন: ক্রান্তীয় অঞ্চলের রাজার সমস্ত অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে, রাষ্ট্রদূত মিথ্যা এটা প্রমাণ হয়। সুতরাং লকের মতে শব্দ কখনো সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হলেও, সেটির মধ্যে সত্য হওয়ার সম্ভাবনা কমবেশি থাকতে পারে। লক তাই বলেন আমদের কাছে যে প্রমাণ আছে তার ভিত্তিতে শব্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যেতে পারে কিন্তু

শব্দ কে সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিত রুপে গ্রহন করা যাবেনা। এই প্রসঙ্গে লক কত গুলি শর্তের উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল

১. সাক্ষীর সংখ্যা
২. তাদের সততা
৩. তাদের দক্ষতা
৪. তাদের উদ্দেশ্য
৫. যা বলা হয়েছে তার অভ্যন্তরীণ সঙ্গতি
৬. কোনো বিপরীত শব্দ আছে কি না অর্থাৎ বাক্যগুলি স্ববিরোধী হবেনা

লক মনে করেন শব্দ নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করেনা কিন্তু এর মানে এই নয় যে অন্যের কথা আমাদের প্রত্যাখ্যান করা উচিত। তিনি বলেন, যুক্তিসংগত ব্যক্তি শব্দের প্রতি আমাদেরকে সম্মতি জানাতে হবে। যখন কোনো বিবৃতি আমাদের নিজস্ব পর্যবেক্ষণের সঙ্গে এক হয় এবং উপরিক্ত শর্তের সঙ্গে মিল পাই, তখন সেগুলিকে আমরা ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে গ্রহন করতে পারি। কিন্তু লকের মতে, শব্দ থেকে প্রাপ্ত তথ্য 'লাল কালো নয়'-এর মতো সত্য নয়, কারণ পরবর্তী অভিজ্ঞতার দ্বারা তা দুর্বল হতে পারে। লক যুক্তি দেন যে ভবিষ্যতের বিপরীত কন শব্দের দ্বারা এগুলির দুর্বলতা প্রমাণ করে যে শব্দ থেকে যা পাই, তা আক্ষরিক অর্থে জ্ঞান নয়।

লকের আলোচনার মধ্যে অসঙ্গতি আছে তার কারণ লক যদি সঠিক হন, তাহলে 'আপনি জানেন আপনি কোথায় জন্মেছিলেন?' এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে 'না' কারণ এই বিষয়ে আমার নিজস্ব কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই এই বিষয়ে আমার জ্ঞান টি পরিবারের বলা কথা বা জন্ম শংসাপত্রের ওপর নির্ভরশীল। জর্জ ওয়াশিংটন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ছিলেন— এটাও আপনি জানেন না; অ্যান্টার্কটিকা বিদ্যমান— এটাও জানেন না যদি না আমরা নিজে সেখানে গিয়ে থাকি।

সুতরাং আমরা খুব সহজেই বলতে পারি যে মানুষ শব্দের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে থাকি। কিন্তু এটাও সত্য যে আমরা বুঝতে পারি যে অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক কথোপকথন কঠোরভাবে সঠিক নয় যেমন, আমরা সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের কথা বলি, অথচ আসলে পৃথিবী ঘুরছে। কঠোরভাবে শব্দ থেকে আমরা জ্ঞান পাই না— এই কথা বলার কারণ হল লকের মতে আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি তে যে ভাবে নিশ্চিত জ্ঞান পাই সেরূপ জ্ঞান শব্দের দ্বারা সম্ভব নয় পরবর্তীতে যে সন্দেহের উদ্ভব হয় প্রশ্নসাপেক্ষ। এই এক একই সমস্যা উপলব্ধি ও স্মৃতির ভিত্তিতে গঠিত বিচারের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য বলে মনে হয়, যেগুলো তিনি জ্ঞান হিসেবে স্বীকার করতে চান। লক মনে করেন, উপলব্ধি মাধমে আমরা জানি যে আমি এখন একটি বই পড়ছি এবং পরবর্তীতে স্মৃতি দিয়ে আপনি জানতে পারি যে আমি বই টি পরেছিলাম— স্মৃতির মাধ্যমে উপলব্ধিগত জ্ঞান ধরে রাখা যায়। তবে এখানেও পরে আমাদের সন্দেহ হতে পারে। এমনকি এখন যদি সত্যিই কিছু উপলব্ধি করি যেমন আমি এখন একটি পাহাড় দেখছি, পরবর্তীতে আমি ভাবতেই পারি যে আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। লক মনে করেন যে পরে সন্দেহ উদ্রেকের সম্ভাবনা আপনার এখনকার জ্ঞানকে খণ্ডিত করবে, যতক্ষন না আমি প্রকৃতপক্ষে এখন উপলব্ধি করছি যে আমি পাহাড় দেখছি এবং সেটি স্বপ্ন নয়। কিন্তু লকের মতে এই একই যুক্তি শব্দের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়: যদি কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে বলে স্মিথ চাকরি পেয়েছে, এবং আপনার এখন তাঁর কথায় কোনো সন্দেহ না থাকে, তাহলে জ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয় নিশ্চয়তা আপনার আছে। যদি পরে আপনি বিপরীত শব্দের কারণে সন্দেহ করতে শুরু করেন, আপনি সেই জ্ঞান হারাতে পারেন, কিন্তু তা প্রমাণ করে না যে আপনার কাছে কখনো জ্ঞান ছিল না। যদি আপনার

তথ্যদাতা জ্ঞানী হন, তাহলে আপনার পরবর্তী সন্দেহ প্রমাণ করতে পারবে না যে আপনার মূল বিচার অসত্য ছিল। কারণ তথ্যদাতা যদি জানতেন যে স্মিথ চাকরি পেয়েছে, তাহলে স্মিথ চাকরি পেয়েছে—এটা সত্য হতে বাধ্য। বিপরীত প্রতিবেদন বিভ্রান্তিকর। অবশ্যই, এমন পরিস্থিতি হতে পারে যেখানে আপনার কোনো সন্দেহ নেই এবং আপনি মিথ্যাবাদীর কথা সত্য মেনে নেন—এটা উপলব্ধিগত বিভ্রমের শিকার হওয়ার মতো।

মধ্যপন্থা: হ্রাসবাদ (Reductionism)

শব্দ কখনো জ্ঞান দেয় না— লকের এই দাবি অনেকেই গ্রহন করেননি। অধিকাংশ দার্শনিক্ মনে করেন শব্দের দ্বারা জ্ঞান সম্ভব যেমন আমরা ভারতীয় দর্শনে দেখলাম। এদের মধ্যে প্রধান হলেন Reductionism এ বিশ্বাসী দার্শনিকগন তাদের মতে আমরা শব্দের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করি,আমরা কিছু লেখা পড়ি, শুনি বা কারও অঙ্গভঙ্গি বা সংকেত ভাষা দেখি— সব ক্ষেত্রেই সাধারণ ইন্দ্রিয় উপলব্ধির মাধ্যমেই শব্দকে গ্রহণ করি। আমাদের উপলব্ধি আমাদেরকে জানায় যে একজন বক্তা একটি বাক্য বলেছেন। এখানে লকের মতের কিছু কার্যকারিতা আছে সেতি হল লক প্রদত্ত শর্ত গুলি আমরা প্রয়োগ করে শব্দের যাথার্থ্যতা প্রমাণ করা যেতে পারে এটি অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে কতটা সঙ্গতি পূর্ণ, বক্তার সততা সম্পর্কে প্রমাণ, এর বিপরীত কোন সম্ভবনা আছে কিনা ইত্যাদি, এবং যখন শব্দ নিয়ে এই চিন্তাধারা 'Reductionism' নামে পরিচিত, কারণ এই মত অনুসারে শব্দের জ্ঞানদানকারী শক্তিকে অন্যান্য উৎসের (বিশেষত উপলব্ধি, স্মৃতি ও অনুমান) জ্ঞানদানকারী শক্তিতে হ্রাস করা যায়।

এই Reductionism দুই রকমের: global and local. global Reductionism অনুসারে, বিশ্ব সম্পর্কে আপনার নিজের অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে আপনাকে শিক্ষা দেয় যে সাধারণভাবে শব্দ জ্ঞানের একটি ভালো উৎস। আমরা অনেক সময় কোথাও বেরাতে গিয়ে অন্য অচেনা মানুষ কে বিভিন্ন পথ জিজ্ঞেস করি, কেউ বলেন; তারপর আমরা সরাসরি সেই পথ অনুসরণ করে নিজেই সত্যতা যাচাই করতে পারি। যেহেতু আমরা প্রায়ই লোকের কথার সত্যতা যাচাই করতে পারি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অতীত শব্দের সত্যতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারি, যা বর্তমানে শব্দ গ্রহণে যথাযথ অভিজ্ঞতাভিত্তিক কারণ হয়ে। এই মতবাদে সব কিছু কে বিনা বিচারে গ্রহন করার কথা বলা হয় না বলেন না যে আপনি সব কিছু বিশ্বাস করবেন। যদি কন বিষয়ে সঠিক যুক্তি না থাকে তাহলে তা বর্জন করা বাঞ্ছনীয়তবে। কিন্তু বিশেষ সতর্কীকরণ চিহ্ন না থাকলে, আমাদেরকে যা যা বলা হচ্ছে তা বিশ্বাস করার একটি স্থায়ী ইতিবাচক কারণ আছে- এ কথা বলা যায়।

অন্য দিকে local Reductionism অনুসারে সব শব্দের জন্য একটি সাধারণ ইতিবাচক কারণ খোঁজার পরিবর্তে বলেন, যে কোনো পরিস্থিতিতে, যে বক্তার কথা গ্রহন করা হচ্ছে সেই ব্যক্তি বিশেষজ্ঞ সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ? সে কি অতীতে আপনাকে সত্য বলেছে? তার বক্তব্য এখন কতটা যুক্তিযুক্ত? তা দেখা প্রয়োজন যদি কোনো পরিস্থিতিতে এই সাধারণ কারণগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী হয়, তবে আপনাকে যা বলা হচ্ছে তার সত্যতা আপনি জানতে পারেন। এই ধরনের আপ্ত ব্যাক্তির কথা আমরা ন্যায় দর্শনে পেয়েছি।

কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তির কাছে দিকনির্দেশনা জিজ্ঞেস করার সময় আমরা প্রায়ই অন্ধভাবে বিশ্বাস করলেও, স্থানিক হ্রাসবাদী বলেন, সেই ভিত্তিতে নিজেদের জ্ঞান অর্জনকারী মনে করা উচিত নয়। জ্ঞান অর্জনের জন্য বেশি সতর্কতা দরকার। সত্যি কথা বলতে, শব্দ যেমন আমাদের ব্যর্থ করতে পারে যেমন তথ্যদাতা অসত বা বিভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু উপলব্ধিও আমাদের ব্যর্থ করতে পারে কারণ অনেক সময় আমাদের চোখের বিভ্রম ঘটে। সুতরাং যেহেতু উভয় প্রকার জ্ঞানের ক্ষেত্রেই ভ্রান্তির সম্ভবনা আছে তাই প্রত্যক্ষের মত শব্দও জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে সম ভাবে উপযোগী।

সিদ্ধান্ত:

উপরোক্ত দুই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে— পাশ্চাত্য দর্শনে testimony এবং ভারতীয় দর্শনে শব্দ বিষয়ক আলোচনার মধ্যে সুস্পষ্ট ও গভীর দার্শনিক পার্থক্য ও সাযুজ্য আছে । উভয়ই স্বীকার করে যে মানুষের জ্ঞানের একটি বৃহৎ অংশ অন্যের শব্দের ওপর নির্ভরশীল। আবার এরা বক্তার বিশ্বাসযোগ্যতা, প্রাসঙ্গিকতার গুরুত্বকে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু বেশ কিছু বিষয়ে তাদের মধ্যে গুরুত্ব পূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান সেগুলি নিম্ন রূপ:

প্রথমত, পাশ্চাত্য দর্শনে জন লক থেকে হ্রাসবাদ পর্যন্ত শব্দকে ব্যবহারিক দিক থেকে অত্যন্ত কার্যকর ও প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করা হয়, কিন্তু তারা মনে করেন যে জ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয় 'নিশ্চয়তা' (certainty) শব্দ দিতে পারে না বলে লকীয় দৃষ্টিতে তা প্রকৃত জ্ঞান নয়। পরবর্তীকালে হ্রাসবাদীরা শব্দকে জ্ঞানের মাধ্যম রূপে স্বীকার করলেও প্রত্যক্ষ, স্মৃতি ও অনুমানের অংশ রূপে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ শব্দ স্বতন্ত্র কোনো জ্ঞানপদ্ধতি নয়, সেটি হল অন্যান্য প্রমাণের সংমিশ্রণ। অন্য দিকে অধিকাংশ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র যেমন ন্যায়, মীমাংসা, অদ্বৈত ইত্যাদি শব্দপ্রমাণকে একটি স্বাধীন ও মৌলিক প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করেছেন।। বিশেষ করে বৈদিক বাক্যকে (অপৌরুষেয় বা ঈশ্বর-প্রণীত) অকাট্য ও স্বতঃসিদ্ধ বৈধ বলে মনে করা হয়। শুধু চার্বাক, বৌদ্ধ ও বৈশেষিক দর্শনে শব্দকে স্বাধীন প্রমাণ হিসেবে মানা হয়নি।

দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য দর্শনে শব্দের সত্যতা যাচাই করা হয় ব্যক্তির নিজের অতীত অভিজ্ঞতা, সাক্ষীর সংখ্যা, সততা, দক্ষতা, উদ্দেশ্য, সঙ্গতি ও বিপরীত শব্দের অনুপস্থিতি ইত্যাদির ভিত্তিতে। বৈশ্বিক হ্রাসবাদ বলে সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেই শব্দে বিশ্বাস করা যায় অন্য দিকে স্থানিক হ্রাসবাদ প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট যুক্তির কথা বলেছেন। কিন্তু ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনে শব্দের বৈধতা নির্ভর করে 'আপ্ত' ব্যক্তির বক্তব্যের ওপর। আবার বৈদিক বাক্য ঈশ্বরের বাক্য বলে স্বয়ংসম্পূর্ণ বৈধ। এছাড়া বাক্যের অর্থবোধের জন্য চারটি শর্ত আবশ্যক: আকাঙ্ক্ষা (পরস্পর সাপেক্ষতা), যোগ্যতা (সঙ্গতি), সন্নিধি (নৈকট্য) ও তাৎপর্য (অভিপ্রায়) থাকা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত লকের মতে শব্দ কখনো নিশ্চিত জ্ঞান দিতে পারে না, কারণ পরবর্তী অভিজ্ঞতা বা বিপরীত শব্দের দ্বারা তা খণ্ডিত হতে পারে। শুধু প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই নিশ্চয়তা প্রদান করে। অনেকে মনে করেন এই দাবি অতিমাত্রায় কঠোর এবং সাধারণ ভাষা ব্যবহারের বিপরীত। কিন্তু ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈদিক বাক্য চিরন্তন ও নিখুঁত বলে নিশ্চিত জ্ঞান দেয়। লৌকিক শব্দও যদি আপ্তের থেকে আসে, তাহলে তা বৈধ।

চতুর্থত, পাশ্চাত্যে শব্দকে স্বাধীন ভাবে যথার্থ জ্ঞানের উৎস রূপে মর্যাদা দেওয়া হয়নি। 'হ্রাসবাদ' শব্দের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করে। অপরপক্ষে ভারতীয় দর্শনে (ন্যায়, মীমাংসা, অদ্বৈত) শব্দপ্রমাণকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মতোই স্বতন্ত্র ও মৌলিক প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়। বিশেষ করে মীমাংসা ও অদ্বৈতে শব্দপ্রমাণের স্থান সর্বোচ্চ, কারণ তাদের কাছে যেহেতু বেদই পরম সত্যের উৎস তাই শব্দ অতি গুরুত্ব পূর্ণ। আধ্যাত্মিকার এই দিক টিকে কেন্দ্র করে শব্দ বিষয়ে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দর্শনে মূল পার্থক্য টি প্রকাশিত হয়।

পঞ্চমত, পাশ্চাত্য আলোচনায় মৌমাছির উদাহরণ টেনে বলা হয়েছে যে মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য মানুষের সাথে প্রতারণা করতে পারে, তাই শব্দের ক্ষেত্রে সতর্কতা জরুরি। কিন্তু ভারতীয় দর্শনেও অবিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির (অনাপ্ত) কথা অবৈধ। তবে আপ্ত ব্যক্তি সংজ্ঞাগতভাবেই সত্যবাদী, ফলে তাঁর কথায় প্রতারণার সম্ভাবনা নেই। বৈদিক বাক্যে তো কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই-ই। বিশেষত ন্যায় ও মীমাংসা দর্শনে

শব্দকে এমন এক জ্ঞানের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যা প্রত্যক্ষণ ও অনুমানের সীমা অতিক্রম করে। এখানে আপ্ত ব্যাক্তির উক্তি জ্ঞানের ভিত্তি, এবং বৈদিক শব্দের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাসযোগ্যতা স্বতঃ সিদ্ধ। ফলে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে শব্দ প্রমাণ কেবল সহায়ক নয়, অনেক ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে প্রধান ও চূড়ান্ত জ্ঞান উৎপাদক। তার ফলে এখানে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য আলোচনার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

উভয় আলোচনা থেকেই প্রতীয়মান হয় যে শব্দ জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত করার সবচেয়ে বড় বাহন। পাশ্চাত্য দর্শন যেখানে শব্দের জ্ঞানদানকারী শক্তিকে যাচাই, সম্ভাবনা ও হ্রাসের মাধ্যমে সীমিত করতে চায়, সেখানে ভারতীয় দর্শন শব্দপ্রমাণকে আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক জ্ঞানের জন্য অপরিহার্য ও স্বতন্ত্র মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু মূল পার্থক্যটি নিহিত রয়েছে epistemic authority বা জ্ঞানগত কর্তৃত্বের ধারণায়: পাশ্চাত্য দর্শনে এটি যাচাই ও প্রমাণনির্ভর, আর ভারতীয় দর্শনে এই আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, যে শব্দপ্রমাণ কেবল বাক্যের পুনরাবৃত্তি নয়, বরং তা জ্ঞানের একটি সুসংহত, যুক্তিনির্ভর ও কার্যকর পদ্ধতি। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উভয় পরম্পরাই একমত যে বক্তার বিশ্বাসযোগ্যতা, বাক্যের সঙ্গতি এবং প্রসঙ্গের সঠিক উপলব্ধি ছাড়া শব্দ থেকে প্রকৃত জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির যুগে (উইকিপিডিয়া, গণমাধ্যম) শব্দের এই শর্তগুলো আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি, শব্দ কখন জ্ঞান দেয়– এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে আমরা 'জ্ঞান' বলতে কী বুঝি তার ওপর। নিশ্চয়তাবাদী দৃষ্টিতে শব্দ কখনো জ্ঞান নয়; বাস্তববাদী বা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তা জ্ঞানের একটি অনিবার্য অংশ। ভারতীয় দর্শনের স্বীকৃত প্রমাণ ব্যবস্থা এই দ্বিধাকে অতিক্রম করে শব্দকে তার যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. অন্নংভট্ট। তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহ-দীপিকা। অনুবাদ: ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৮।

২. ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ। ভাষাপরিচ্ছেদ। সম্পাদনা: ড. অনামিকা রায় চৌধুরী। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৫।

৩. তর্কবাগীশ, ফণীভূষণ। ন্যায় পরিচয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৭৮।

৪. মণ্ডল, প্রদ্যোৎ কুমার। বৈশেষিক দর্শন। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১১।

৫. ভট্টাচার্য, ডঃ শ্রীআশুতোষ। বেদান্তদর্শন—অদ্বৈতবাদ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৬১।

৬. যোগীন্দ্র, সদানন্দ। বেদান্তসার। ব্যাখ্যা: বিপদভঞ্জন পাল।সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৬।

৭. মাধবীয়, সায়ণ। সর্বদর্শনসংগ্রহ। সম্পাদনা: অমিত ভট্টাচার্য। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৩।

৮. Sharma, Chandradhar. A Critical Survey of Indian Philosophy. Motilal Banarsidass, Delhi, 2016.

৯. Locke, John. An Essay Concerning Human Understanding. Edited by Peter H. Nidditch. Clarendon Press, Oxford, 1979.

১০. Nagel, Jennifer. Knowledge: A Very Short Introduction. Oxford University Press, Oxford, 2014.